দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT. 28 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

...ব্যবস্থা

স্বাধীনতার পর শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে এ যাবৎ বাংলাদেশে গঠিত হয় ছয়টি কমিশন। প্রতিটি কমিশনই সময়মত রিপোর্টও পেশ করিয়াছে। রিপোর্ট প্রকাশের পর বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা হইলেও বাস্তবায়ন হইয়াছে সামান্যই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের এক কিয়দংশও বাস্তবায়িত হয় নাই। ছাত্রসমাজের প্রতিবাদের মুখে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আতুড় ঘরেই মারা গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে গত সাড়ে তিন দশকের ইতিহাসে। সম্প্রতি পত্রান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদায়ী সরকারের মেয়াদকালের মধ্যে গঠিত হয় দুটি কমিশন। ২০০১ সালের ২৪ ডিসেম্বর গঠন করা হয় শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি। ওই কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল একশত দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এমন কিছু বিষয় চিহ্নিত করা। সেই কাজটি তাহারা করিয়াও ছিলেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে গঠিত হয় ষষ্ঠ শিক্ষা কমিশন। ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ ওই কমিশন প্রধানমন্ত্রীর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারিশমালা পেশ করেন।

ষষ্ঠ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালায় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্বরূপ কী হইবে সে সম্পর্কেও বলা হইয়াছিল ওই রিপোর্টে। স্বতন্ত্র শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন, কোচিং সেন্টার ও নোটবই নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হইয়াছিল। ওই রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়া সপ্তাহে ৬ ঘন্টা অর্থাৎ প্রতি কর্মদিবসে এক ঘন্টা করিয়া প্রাইভেট টিউশনি করিতে পারিবেন। তবে তাহা স্কুল আঙ্গিনার বাহিরে নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হইয়াছিলো কমিশনের রিপোর্টে। ফাজিল ডিগ্রিকে ব্যাচেলর এবং কামিলকে মাস্টার্সের মর্যাদা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলিকে সরকারি নজরদারির আওতায় আনিবার সুপারিশ করা হইয়াছিল রিপোর্টে। অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিশনের অভিমত ছিলো এইরূপ: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব হইবে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ে গবেষণা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইবে জ্ঞানরাজ্যের বর্ণিল প্রশিক্ষণাগার।

২০০৪ সালে উপরোক্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর বুদ্ধিজীবী মহলে সৃষ্টি হইয়াছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তৎপরবর্তীতে ওই রিপোর্টের কতকাংশ বাস্তবায়িত হইলেও বেশীর ভাগটাই রহিয়া গিয়াছে বাস্তবায়নের বাহিরে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠিত না হইলেও বেসরকারী শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্ত প্রাক-যোগ্যতা যাচাইপূর্বক রেজিস্ট্রেশনের একটা পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ হয় নাই। কোচিং সেন্টার সম্পর্কেও কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই। স্কুল পর্যায়ে নোটবই অনেক আগে হইতে নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে নোটবইয়ের ছড়াছড়ি। গাইড বই এবং নোটবই ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছেলেমেয়েদেরও যেন এখন চলিতে চাহে না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেইরূপ সংস্কার প্রত্যাশিত সেইরূপ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন যেসব সুপারিশ পেশ করিয়াছে, সেসবও কতখানি পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তবসম্মত তাহা নিয়াও আছে মত-মতান্তর।

আসলে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা-এ দুইয়ের মধ্যে আমাদের দেশে পূর্বাপর থাকিয়া যাইতেছে ব্যবধান ও বৈপরীত্য। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হইল মানব সম্পদের উন্নয়ন। সর্বদিক দিয়া দক্ষ, যোগ্য এবং আলোকিত মানুষ তৈয়ারি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। গ্লোবালাইজেশনের যুগে প্রয়োজন বিশ্বমানের শিক্ষা। কেবল নিজ দেশের ভিতরে নয়, বহির্বিশ্বে যাহাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেইভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার মত ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রথমে মৌলিক শিক্ষা বা বেসিক এডুকেশনটা সকলের জন্য অবারিত করিতে হইবে। প্রাইমারি হইতে শুরু করিয়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে, যাহাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী মানবিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রটি যাহাতে এই সময়ের মত ভালমত কর্ষিত হয়, সেইদিকে অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অনিয়ম অসঙ্গতিও মোচন করিতে হইবে। ডিগ্রিসর্বস্ব শিক্ষাকে বিশ্বমানে সময়োপযোগী এবং জ্ঞাননির্ভর শিক্ষায় রূপান্তরিত করিবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।